ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 135- 141
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.279

‘মহানদী’: প্রবাহমান উপাখ্যান

বেবী পারভীন, *গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, অসম, ভারত*

Received: 06.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Anita Agnihotri’s novel *Mahanadi* (2015) stands out as a remarkable example in the tradition of river-centric novels. In *Mahanadi*, there is no conventional backdrop of plot, story, or narration. The novel does not focus on a specific region or settlement; rather, as the river flows, twists, and turns, new people emerge in the narrative. Starting from the Malbhum region of Chhattisgarh, the Mahanadi travels over five hundred crores of distance, eventually merging into the Bay of Bengal. The novel does not follow a continuous storyline and is divided into twelve chapters.

It portrays the lives of weavers, blacksmiths, farmers, artisans, fishermen, and forest-dwelling people, alongside the displacement of hundreds of individuals in the name of dam construction and development. In April 1948, the then Chief Minister of Odisha, Dr. Harekrushna Mahatab, inaugurated the Hirakud Dam through Prime Minister Jawaharlal Nehru. At that time, 24 impoverished, illiterate families were uprooted from Jamda without any preparation. These landless, nearly destitute tribal and marginalized families were never provided alternative housing, nor did they receive any compensation. They had to leave behind their homes, household belongings, and cultivated fields.

The author shows how the weavers were reduced to wage laborers in their own craft. For the artisans of Maniabandh, survival required daily struggle; the scarcity of capital made their lives unbearable. Extreme poverty and lack of resources strained marital relationships and even extinguished the basic desire to survive. Karna’s suicide in the novel highlights this harsh reality. The artisans’ poverty is so severe that the same vessel they use to dye cloth is used to cook rice. Many women from fishing families, like Parvati, often do not get enough food daily; their children suffer from the heat in urban areas.

The novel spans a vast region, from the Malbhum plateau in Chhattisgarh to the estuary of the sea, reflecting both human and environmental dimensions along the river’s journey.

Keywords: Helpless wildlife, Hirakud Dam, displaced people, water blasting, weavers, forest–human interaction

প্রথম পর্ব ‘বৈদ্যরাজ’ এ এসেছে ফরেস্টার অবধূত সিং, গোঁড় আদিবাসী তুলারাম ধুরু ও তার পত্নী পুনরি এবং ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী সুজন কুমারের প্রসঙ্গ। তুলারাম ধুরুকে এক ডাকে মানুষ চেনে বৈদ্যরাজ বলে। গ্রামের কোন কোন আলসে স্বার্থপর মানুষ মহুল কুড়ানোর সুবিধার্থে বনের ঘাসে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঘাস। ঘাসের সঙ্গে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় ভূমিতে পড়ে থাকা বীজ, লতাগুল্ম, পড়ে থাকা ঝরা পাতা যা বৃষ্টির জলে পচে পরিণত হতো জৈব সারে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়, “অরণ্য তার ত্বক, পিঠ, বুক, মুখের

হাসি সবকিছুর ভাঁজে, পরতে জমিয়ে রাখে নানা সম্পদ অসময়ের জন্য"। আর এসব এক নিমেষে শেষ করে দেয় কিছু স্বার্থপর মানুষ। 'সন্দুর' নামের নদীটিতে বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীটির জলভান্ডার বিশাল এক অরণ্য অঞ্চল, গাছপালা এবং পশুপাখিদের বিচরণভূমিকে ডুবিয়ে দেয়। এই জল শাল, বিজা, সাজা, হলুদ, আমলকী গাছেদের, অজস্র শিয়াল, ডাক হরিণ, লঙ্গুর, ভালুক, উড়ুক্কু কাঠবিড়ালি, হায়না, কুমির, ভোঁদড়, মাছরাঙা, ধনেশ, জলপিপি, কুম্ভাটুয়া, দয়েল, অজস্র সাপ এবং সরীসৃপ সমস্ত কিছুকেই শেষ করে দিয়েছে এক লহমায়। গুটি কয়েক মানুষের সুবিধার্থে মানুষ বাঁধ তৈরি করে দিনের পর দিন নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে বহু প্রাণ। আধুনিক পৃথিবীর এই জ্বলন্ত সমস্যা অনিতা অগ্নিহিত্রী 'মহানদী' উপন্যাসে সহমর্মিতার সাথে তুলে ধরেছেন। অবিবেচক মানুষেদের নির্বিচারে বন ধ্বংস করার কারণে বনাঞ্চলে প্রাণীদের জায়গার টানাটানি, তাদের থাকার জায়গা মানুষ কেটে পুড়িয়ে ধ্বংস করছে দিনের পর দিন, গ্রীষ্মে খাওয়ার জল নেই যখন তখন আগুনের ভয়, চোরা শিকারির ভয়,পালিয়ে কোথাও গ্রামে ঢুকলে মানুষের মার,ট্রেনে কাটা পড়ছে হাতি, বাঘ, সম্বর হরিণ। উপন্যাসে লেখিকা দেখিয়েছেন চলতি গাড়ির ধাক্কায় মারা পড়েছে কচি একটা হায়না, বয়স ছ'মাসও হয়নি।এভাবেই প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য বন্যপ্রাণ।

এক হৃদয় ভারাক্রান্ত করা কাহিনী পর্ব হল 'মহুল সই'। মহানদীর বন্যায় কটক ও অববাহিকা অঞ্চল প্লাবিত হয়, হীরাকুদ বাঁধ নির্মাণ করে তাই সম্বলপুরের ২০০ গ্রামকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জলের তলায়-রাজ্যের উপকূল অঞ্চলের স্বার্থে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বলি দেওয়া হয়। মহানদীর কূলে সদা জলে ছল ছল কুঠোরপালি থেকে তাদের খেদিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা জুজুমারা পঞ্চায়েতের নুয়াবলন্ডায়। তাদের অসহায় চোখের সামনে তাদের নিজের হাতে লাগানো খেতের পাকা ধান ডুবে গিয়েছিল। সরকার বলেছিল-

> "ওসব রেখে যাও আর আকাটা গাছটাছও। তোমাদের টাকা ধরে দেওয়া হবে-ওই সব রেখে যাওয়া জিনিসের মূল্য। সে ক্ষতিপূরণ আর কোনওদিন আসেনি। একর পিছু ৪০০ টাকা মতো নিয়ে ওদের চলে আসতে হয়েছিল। কুঠোরপালির এরাই ছিল হীরাকুদ বাঁধভাসিদের শেষ উদবাস্তু দল।"[১]

শ-দেড়েক মানুষের জীবনের ত্রিশ- পঁয়ত্রিশ- চল্লিশ বছরের উপার্জন সব শূন্য হয়ে গিয়েছিল একদিনে। হিমিরানী ঘরছাড়া মানুষদের কষ্টের কথা মুখে বলতে পারতো না বলে বালক কুবের কে ডানা ছটফটনো পাখিদের কথা বলে ঘুম পারাতো-

> "পাখিগুলি জলের উপর গোল হয়ে ওড়ে আর ওড়ে। কে বলে দেবে কোন গাছে ছিল তাদের না ফোটা- ডিম, তাদের না উড়তে শেখা ছানারা"[২]

বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষদের নুয়াবলন্ডায় গিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সেখানে কোন নদী ছিল না। সরকার থেকে যে কয়েকটি কুয়ো খুঁড়ে দিয়েছিল তার জল পানের যোগ্য ছিল না। বন কেটে জমি খালি করতেই কুড়ি বছর লেগেছিল, চাষের কোন জমি ছিল না। বৃদ্ধদের কথায়-

> "বন কেটে জমি খালি করে চাষের উপযুক্ত করে তুলতেই কেটে গেল আমাদের যৌবনকাল।... ডাক্তার আসত আট দিনে এক দিন। দিগরে হাসপাতাল ছিল না।মানুষ মরার হাল হলে মুখে একটু মহানদীর জল দিয়ে বসে বসে দেখতাম"[৩]

কি নিদারুণ যন্ত্রণায় কষ্টে দিন কেটেছে ভাবাও যায় না। এই বাস্তুচ্যুত কিসান,কুলতা, গোন্ড, নাপিত, ধোপাদের সরকার তো খেদিয়ে দিয়েছিলই তার সাথে আমিন ইন্সপেক্টর রাও জোঁকের মতো রক্ত চুষে খেয়েছিল। বৃদ্ধরা জানায়-

"ঘুষ চাইতো সবাই। না দিলে ভুলভাল মেপে দিত জমির চৌহদ্দি। টাকাঅলা আর উপর জাতদের ভালো ভালো নিচু জমি বেছে বেছে দিত... ওদের জন্যই তো মরলাম আমরা"[৪]

হীরাকুদের জলভান্ডারের জন্য যারা ঘর আর জমি ছেড়েছিল তারা কেউই ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পায়নি। ঘরের দাম, গাছের দাম, জমিয়ে দাম সবকিছু ধার্য করা হয়েছিল বাজারদরের অনেক নিচে। হীরাকুদ বাঁধের ভিত পাথর স্থাপন করতে এসে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন যে কষ্ট যদি পেতেই হয় তবে দেশের স্বার্থে কষ্ট স্বীকার করো।কষ্ট তারা পেয়েছে ঠিকই তবে সেটা কতখানি দেশের জন্য এবং আর কতখানি ক্ষমতাশালী শ্রেণীর স্বার্থপরতায়- তা ভাবার বিষয়।

হীরাকুদ জলভান্ডার থেকে বেরিয়ে মহানদী সম্বলপুর হয়ে সুবর্ণপুরে ঢুকেছে।এই 'সুবর্ণপুর' পর্বে লেখিকা জানিয়েছেন হীরাকুদ বাঁধ বাঁধার পর থেকে নদীতে মাছ কমা শুরু হয়েছে।শুধু তাই নয় সোনপুরে, কিয়াকাটাতে নদীর উপর ব্রিজ তৈরির ফলে নৌকো চালানো যাদের বংশানুক্রমিক বৃত্তি ছিল তারা কাজ হারা হয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। সবচেয়ে যা ভাবনার বিষয় লেখিকা তুলে ধরেছেন তা হল জলে ব্লাস্টিং। স্থানীয় লোক, ধীবর কেওটরা অল্প পয়সার লোভে এই চক্রে জড়িয়ে গিয়েছিল। ব্লাস্টিং– এ বড় মাছ মরে, অসাধু লোভী ব্যবসায়ীরা সেই মাছ কম দামে দ্রুত বিক্রি করে। প্রতিনিয়ত ব্লাস্টিং এর ফলে জল হয়ে যায় ভীষণ পরিমাণে দূষিত। লেখিকা লিখেছেন-

"লাগাতার জলে ব্লাস্টিং আর চিংড়ি মারার জন্য বিষ দেওয়ার ফলে মাছের ফলন কমে তলানিতে ঠেকেছে ঝরাপাড়ায়"[৫]

এই পর্বে আছে দুটি কাহিনী- সত্যেন্দ্র স্মিতা সুবলের কাহিনী আর কৈবর্ত মাঝি নীলকণ্ঠের জীবন হারানোর কাহিনী। অভাব অনটনের মধ্যেও সুবলের মধ্যে সাহিত্য রচনা সুপ্ত প্রতিভা বিদ্যমান। আর তার পাশে রক্ষাকর্তার মত পাশে থেকেছেন উদার মনোভাবাপন্ন অধ্যাপক সত্যেন্দ্র প্রধান। ঝাড়খণ্ডের মেয়ে দিল্লিতে কর্মরত অধ্যাপিকা স্মিতা কুজুর ও পঁচাত্তর বছর বয়সী প্রবীণ গান্ধীবাদী সাবিত্রী দেশমুখ এর সংগ্রামী সত্তা উপন্যাসে উঠে এসেছে। নীলকণ্ঠ ওরফে গঙ্গারাম এর জেলে জীবনের বেদনা লেখিকা সুনিপুন ভাবে এঁকেছেন। অভিশপ্ত হীরাকুদ বাঁধ ও তার উপর নির্মিত ব্রিজ নৌকার মাঝিদের পাশাপাশি জেলে জীবনকেও সংকটাপন্ন করে তুলেছে। স্মিতার ভাবনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক নিজের ভাবনাই ব্যক্ত করেছেন-

"প্রকৃতি, পাহাড়, নদী জল, মৃত্তিকাজাত ঐশ্বর্য তা কি আর ভূমির সন্তানদের আছে?"[৬]

তাঁত শিল্পীদের জীবনের নিদারুণ বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে 'উপনদী' পর্বটিতে। 'তেল' হল মহানদীর সবচেয়ে বড় উপনদী। তেল ও মহানদীর সঙ্গমে আছে বৈদ্যনাথ নামের গ্রামটি। এই গ্রামেরই রমেশ মেহের প্রতিভাহীন তাঁত শিল্পী থেকে হয়েছে সম্পন্ন ব্যবসায়ী। অনেক তাঁতি গ্রামে তাঁতিকে কাজ জোগানের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য সমবায় সমিতি। কিন্তু এগুলি প্রায় বেশিরভাগই সুতো-মজুরির দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছিল, খাতা কলমে শয়ে শয়ে তাঁতির নাম লিখে রাখে তারপর সেই নাম গুলো ব্যবহার করে ভুয়ো উৎপাদনের হিসেব দেখিয়ে সরকারি ভর্তুকি নেয়।এমনকি সমিতির স্টক দেখানো হয় বাজার থেকে হোলসেল দরে কাপড় কিনে। এই সমবায় সমিতি এক দশমাংশ তাঁতিকেও কাজ জোগাতে পারে না। তাঁত শিল্পীরা হারে হারে টের পেয়েছে-

"যে তারা আসলে শিল্পী নয়, তাঁত মজুর মাত্র।"[৭]

তারা বুঝেছে সমিতির ভরসায় থাকলে মাসের সাত দিনের বেশি কাজ তারা পাবে না এবং শুকিয়ে মরতে হবে। লেখিকা তুলে ধরেছেন শিল্পীদের কিভাবে তাঁত শিল্পী থেকে মজুরে পরিণত করা হয়েছে। মাস্টার উইভার-

'মাস্টার' এর দল সমিতির ভগ্নদশা থেকে উঠে এসে মজুরদের মালিকে পরিণত হয়েছে। ভাড়ায় নেওয়া বড় বড় কারখানায় মজুর খাটায় আর লাভ করে নিজের আখের গুছিয়ে নেয়। মাথার ওপর ছাদ, নীচে দুই পা রাখার গর্ত,তাঁতটি এবং নিজের শরীর– এসব ছাড়া তাঁতির নিজস্ব বলতে আর কিছুই নেই। নিজের শরীর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অকালেই ঝরে যায় তাদের জীবনটুকু। চোখে চশমা চড়ালেও সে চশমা বদলানোর সামর্থ্য থাকে না তাদের। বর্ষায় গর্তের মধ্যেই দুটি পা কনকন করতে থাকে, জ্বর হলেও কাজ ছেড়ে ওঠার কোন উপায় তাঁতির নেই। আধপেটা খেতে খেতে দশ দিনের জ্বরে বেঘোরে মরে যাওয়া গেছে সাধারণ ঘটনা। উপন্যাসে এসেছে কাপড়ে কেমিক্যাল রঙের পরিবর্তে ভেষজ রঙের ব্যবহারের প্রসঙ্গ। মূল্য বৃদ্ধির বাজারে পঞ্চাশ বছরেও তাঁতিদের কোন মজুরি বাড়েনি। পিছু হটতে হটতে তাঁতিদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। সুনিপুণ দক্ষতায় ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন কিভাবে মজুরদের শোষণ করা হয়-

> "রমেশ দ্রুত ভেবে নিচ্ছিল, মজুরি বাড়ার আগে- কোথা থেকে কত স্টক সে পুরনো দামে তুলতে পারবে- যাতে মাস ছয়েক তার লাভের টাকায় হাত না পড়ে। হ্যাঁ, অবশ্য দামও সে বাড়াবে-বাইরের বাজারে বলবে, নিজে থেকে মজুরিদের মাইনে বাড়িয়েছে, কাজেই বাড়া দামটা যাবে শ্রমিকদের হাতে- এতে দামী দোকানে সমাজে পরিচিত ক্রেতারা খুশি হন-মনে করেন, এই জিনিস কিনে তারাও সামাজিক কর্তব্য করছেন।"[৮]

মজুরি বাড়ানোর আন্দোলনে তাঁত শিল্পী, বুনাকারদের একজোট করা খুবই পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। বিষয়টা রমেশের মতো ব্যবসায়ীদের ভালোমতোই জানা থাকে বলেই টাকার ব্যবহার করে মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন ভেস্তে দিত তারা। সুবর্ণপুরের তাঁতের এত নাম ডাক থাকা সত্ত্বেও ঝরা মেয়েদের গায়ে তাদের শাড়ি উঠত না। কারণ তাঁতের একটা সস্তা শাড়িও চারশোর কম নয়, তারা পরে একশো কুড়ি টাকার ছাপা মিলের শাড়ি। ঔপন্যাসিক এখানে তাঁতিদের অবর্ণনীয় দুঃখ দারিদ্র্যের ছবি এঁকেছেন।

'প্রত্নবিষাদ' পর্বে এসেছে হারাধন মাস্টার ও গন্ধ আদিবাসীদের জীবন যাপন। হারাধন মাস্টারের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও ইতিহাসের অনুসন্ধান আসলে নিজের মাতৃভূমির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রদর্শন। 'নির্জন, গভীর' পর্বে উনপঞ্চাশ বছর বয়সী সাংবাদিক রঙ্গ অভয়ারণ্যের গভীরে কোর এরিয়ার ছোট, বিচ্ছিন্ন গ্রাম গুলোর খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের উলঙ্গ রূপ দেখাতে এসে অস্বস্তি বোধ করে। শারীরিক চাহিদা, ইচ্ছেমতো দীর্ঘদিনের সঙ্গিনীকে একঘেয়েমির অজুহাতে ছেড়ে দেওয়া, অরণ্য অঞ্চলে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে ভোগা মানুষগুলোর কথা শোনার মধ্যে যে কৃত্রিমতা তা রঙ্গ চরিত্রটিকে একটি অমানবিক চরিত্র রূপে চিত্রিত করেছে। রঙ্গর প্রশ্ন শুনেই বঞ্চিত নিরাপত্তাহীন বিচ্ছিন্ন জনপদ ক্ষোভে হয়ে উঠেছিল মারমুখী। সুমনা চরিত্রটি সহকর্মী সচেতন সংবেদনশীল নারী রূপে অঙ্কিত হয়েছে। এই পর্বে কন্ধ আদিবাসী হরমু চরিত্রটি একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তার মুখে বর্ণিত গল্পগুলি পাঠকের মন ভরিয়ে দেয়। এই পর্বটিতেই জানা যায় সাবিত্রী ও স্মিতা কেন কোথায় এসেছিলেন আর কেনই বা তারা জনতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। নিয়মগিরি পর্বত অঞ্চলে বক্সাইট খনন নিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শিল্পসংস্থার টানা লড়াইয়ে এক নিরপেক্ষ তৃতীয় সংস্থার অনুরোধে সরেজমিনে তদন্তে এসেছিলেন সাবিত্রি ও স্মিতা। এই বিষয়ে স্থানীয় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কিছু আলোচনা করতেই নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে তারা থানায় গিয়েছিলেন। জনতা যখন সাবিত্রী ও স্মিতা কে থানার মধ্যেই আক্রমণ করেছিল তখন পুলিশ জনতাকে কোনরকম আটকানোর চেষ্টা করেনি। এই প্রসঙ্গে চরম বাস্তবতা মূলক বাক্য উঠে এসেছে উপন্যাসে-

> "রাষ্ট্রের হয়ে শিল্প যখন ক্ষমতাশীল জনমতকে নিয়ন্ত্রিত করতে সফল হয়, তখন পুলিশ কে লাঠিও চালাতে হয় না।"[৯]

ঔপন্যাসিক উপন্যাসে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে শাসকপক্ষ চালিত রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটলে কেন্দ্র না দেখার ভান করে থাকে অন্যদিকে বিরোধী শাসিত রাজ্যের সমালোচনা শাসক দল করলে বিরোধীদল আইন শৃঙ্খলায় হস্তক্ষেপ এর অভিযোগ নিয়ে আসে। অনিতা অগ্নিহোত্রী সুনিপুণভাবে সমকালীন রাজনীতিকে তুলে ধরেছেন। অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় 'অনিতা অগ্নিহোত্রীর মহানদী: একটি বিমোহিত, অসংলগ্ন প্রতিক্রিয়া' তে লিখেছেন, 'অনিতার এই উপন্যাস পড়ে আমরা বুঝি যে অত্যাচারী রাষ্ট্র আর বৃহৎ বেসরকারি পুঁজির এই নব্য উদারনৈতিক প্রণয়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের রাস্তা বন্ধ।'

অভয়ারণ্য কোর এরিয়ার মধ্যে যে গ্রামগুলি রয়েছে সেই গ্রামগুলিতে বহু বছর ধরেই মানুষ বসবাস করতো, অরণ্যই ছিল তাদের চারপাশে অভয়ারণ্য ঘোষিত হয়নি তখন। একসময় অরণ্যের গভীরতায় আঘাত হেনেছিল কুঠার। শুরু হয়েছিল জল, ফল ও পশু মাংসের জন্য মানুষ ও পশুর দ্বন্দ্ব। তার চেয়েও অনেক বেশি বিপদ হেনেছিল বহিরাগত ব্যবসায়ীদের লোভ। পরবর্তীতে শিল্প শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয়। তাদের লোভে লাগাম দিতেই এসেছিল জঙ্গল আইন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন। কিন্তু অভয়ারণ্য চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার পরে অরণ্যের কোলে শৈশব থেকে লালিত অরণ্য- সন্তানদের আশ্রয় হয়ে উঠলো অনিশ্চিত। এর ফলশ্রুতিতেই একের পর এক অরণ্য গ্রাম ঠিকানাহীন মানুষের বাসভূমিতে পরিণত হয়েছিল। হরমু এমনই এক সবদিক থেকে বঞ্চিত গ্রামের বাসিন্দা। হরমুর গ্রামের বাসিন্দাদের দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্রতা শহরবাসী মানুষের ভাবনারও বাইরে। চারিদিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে পাতা বা টালি ছাওয়া মাটির ঘরে বাইশ তেইশ টা পরিবার। এই গ্রামের মানুষ দারিদ্র ও অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে সময়ের আগেই ঝলসে বুড়ো হয়ে গিয়েছে। চাষের জন্য জল থাকেনা,কোর এরিয়া হওয়ায় নদীর জল তুলতে পারেনা। বর্ষার জলে ভরসা করে যতটুকু ধান, মকাই, শাকসবজি ফলায় সেইসব নীলগাই, বরাহ আর হাতির দল পায়ে দলে নষ্ট করে দেয়। গ্রামবাসীদের আক্ষেপ-

> "বনের প্রাণীর রক্ষার জন্য আইন আছে, মানুষের পেটের ক্ষিদে মেটাবার জন্য কোনও আইন নেই। খালি হাতে, তাড়া করে ওদের ভাগাই। আগুন জ্বালতে পারবো না কোর এরিয়ার মধ্যে আগুন বারণ। খালি হাতে লড়ে লড়ে আমরা হয়রান হয়ে গেছি।"[১০]

খাদ্যের অভাবে তারা জঙ্গল থেকে কন্দমূল তুলে খায়। খেজুরের চাটাইয়ে কন্দমূল শুকোতে দেখে সুমনার বুকের ভেতরটা ছটফট করে উঠেছিল। ঔপন্যাসিক এই পর্বে অরণ্য বাসি মানুষদের দুঃখ দুর্দশার সুনিপুণ ছবি অত্যন্ত সহমর্মিতার সাথে তুলে ধরেছেন।

কন্টিলো গ্রামে কাঁসারিদের বসবাস এবং কাঁসা ধাতু নির্মাণে কাঁসারীদের অমানুষিক পরিশ্রম ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। কাঁসার পাত্র তৈরি করতে কাঁসারিদের 'বুকের রক্ত মুখে উঠে আসে'-তবু ক্রেতারা কাঁসার সঠিক মূল্য বোঝেনা। 'নীলমাধব' পর্বে উঠে এসেছে সমকালীন অন্ধ্রপ্রদেশ ও ছত্রিশগড় সীমান্ত অঞ্চলে মাওবাদী উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির প্রসঙ্গ। মাওবাদীদের সঙ্গে লড়াইয়ে আশু কামারের পুলিশ পুত্রের উরুর ওপর থেকে দুটি পা কেটে বাদ দিতে হওয়ায় আশুর পরিবারকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। ১৯৯৯ এর মহাবাত্যায় বাবা মা হারা শিশু সন্তানকে শবর রমণী শনিচড়ীর সাহায্যে মানুষ করেছিল আশবরী। আশাবরী শিশু কন্যার নাম রেখেছিল ঝঞ্ঝা। অকাল বর্ষণ ও ঘূর্ণিঝড়ে উপকূল অববাহিকা অঞ্চলের বিধ্বস্ততা উপন্যাসে উঠে এসেছে।

'টানি ও ভরনি' পর্বে আছে বান্ধ শিল্পী উপমন্যু ও তার ভাই নিরঞ্জন এর কাহিনী। উপমন্যু পুরনো সংগ্রহের ব্যাকুলতার জন্য অনেক ঠকেছেন। দীর্ঘ ছয় বছরের নিরলস পরিশ্রমে তিনি রেশম বস্ত্রের ওপর জয়দেবের গীতগোবিন্দ লিখেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে নিরামিষ আহার, স্ত্রী সঙ্গ ত্যাগ এবং চার বছরের শিশু সত্যবান হয়ে উঠেছে দশ বছরের সবল বালক। শিল্পের জন্য শিল্পীর এই আত্মত্যাগ, সাধনা কুর্নিশ জানানোর মতো বিষয়। 'ময়নাতদন্ত' পর্বে মানিয়াবন্ধের বুনাকারদের জীবনচিত্র এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। মানিয়াবন্ধে প্রত্যেক ঘরে অভাব

অনটন লেগেই থাকে। অভাবের পাঁকে মানুষ এমন ভাবে ডুবে থাকে যে তাদের মাথাপিছু আয় কত সেটা তারা হিসেব করার সময় পায় না। মহাজন সুদের টাকা গুনে নেয়, পাইকারি কাপড়ের ব্যবসাদার সুতো, রং দাদন দিয়ে যায় দরজার কাছেই। দাদনদাররা দরজায় আসে বলে প্রতি কাপড়ে পঞ্চাশ টাকা করে কম মজুরি দেয়। বুনাকারদের এমন মনের জোর, দেহের বল নেই যে হাটে গিয়ে নিজে বেঁচে আসবে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন-

> "দারিদ্র্য মানুষের শিরদাঁড়ার ভিতরে ঘুণ ধরিয়ে দেয়। কতখানি পঙ্গু হয়ে যায় মানুষ, তা সে নিজেও জানে না।"[১১]

মানিয়াবন্ধে শখানেক হতদরিদ্র পরিবার আছে যাদের না আছে চাষের জমি না আছে তাঁত। দাদন নিয়ে বান্ধসুতোর কাজ করে। মহাজনের কাছে পরাধীন দিন আনা দিন খাওয়া এই বান্ধকাজের কোনও শিল্প মূল্য থাকে না। রঙ্গনী বান্ধকার কর্ণকুমার তোষ অভাব অনটনে সুতো রাঙ্গানোর কেমিক্যাল- পটাশিয়াম নাইট্রেট খেয়ে মারা যায়। এটা আত্মহত্যা হলেও আসলে এটা মার্ডার। উপন্যাসে এসেছে গত আট বছরে সাতচল্লিশটা মৃত্যু ঘটেছে এই সুতোর রাঙানোর কেমিক্যাল দিয়ে। সরকার, রাজনৈতিক নেতারা ভালো করেই জানে যে অভাব অনটনে মৃত্যু ঘটছে কিন্তু তদন্ত রিপোর্টে কখনোই লেখা থাকে না এই অনাহারের কারণে মৃত্যুর কথা। টেক্সটাইল ইন্সপেক্টর অরূপ কে ময়না তদন্ত রিপোর্টে সরকারের কাছে পেশ করতে হয় যে কর্ণ কুমার সত্যিই অভাবে মরেনি, ক্ষিদেয় মরেনি।

অধিকাংশ তাঁতমজুরের ঘরেই রং ফোটাবার আলাদা পাত্র থাকে না, একই পাত্রে রং ফোটায়, আবার সেই পাত্র ধুয়েই ভাত রান্না করে। বিষাক্ত কেমিক্যাল পেটে গেলেও তাদের সামর্থ্য থাকে না আর একটা পাত্র কেনার। কাজের মরশুমে পুরো পরিবার মিলে মাসে আয় হয় দেড় থেকে দু হাজার। এই যৎসামান্য টাকায় কি করে যে সংসার চলে,কতটা অভাব অনটনে চলতে পারে এই টাকায় তা অনুমান করতেও কষ্ট হয়। এদের কারো জমি নেই কেবল মজুরির টাকায় ভরসা। উপন্যাসে এসেছে চল্লিশ বছর বয়সী তাঁত মজুর কে সত্তরের বৃদ্ধ মনে হয়। এই পর্বেই আছে দুই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার প্রসঙ্গ।সেই বৃদ্ধটির নতুন চশমা দেখে বালকের মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল অরূপ। চশমাটি ছিল-

> "সম্পূর্ণ ভাঙ্গা নয়, ফ্রেমে ধরা আছে দুটি ফাটা ও পাঙাশ কাঁচ, একদিকে একটি তার দিয়ে ডাটি বানানোর চেষ্টা হয়েছে, অন্যদিকে একটি মোটা দড়ি.... এটা মাঝে মধ্যে পরা হয়। নতুন কিনা।"[১২]

অনিতা অগ্নিহোত্রী লিখেছেন যে স্বাধীনতার ষাট বছর পর আমাদের এক গুণী কারিগরের চশমাটি এইরকম। 'মোহানা' পর্বে প্রকাশ পেয়েছে সার কারখানার বিষে ভেতর নদীতে মাছ আসে না, অন্যদিকে বার নদীতে কুমিরের ডিম দেওয়ার কারণে মাছ ধরা নিষিদ্ধ হয়। এ কারণে ছেলেদের বৃত্তি অনিশ্চিত হয়ে পরে। জেলে পরিবারের পার্বতীর মত বহু নারী অন্নসংকটে ভোগে। পার্বতীর ছেলে শহরে হোটেলে কাজ নিতে বাধ্য হয় এবং সেখানেও অত্যাচারের শিকার হয়। কিন্ত লুনকুয়া একটা সময় সমৃদ্ধ কুমোর শিল্পীদের গ্রামে পরিণত হয়।

ছত্রিশগড়ের মালভূমি থেকে মহানদীর পথ চলা শুরু হয়েছিল। জগৎসিংহপুরের বঙ্গোপসাগরে এসে তার যাত্রা শেষ হয়। হীরাকুদের উচ্ছিন্ন মানুষের দীর্ঘশ্বাসে ঝঞ্ঝা তাড়িত উপকূল অঞ্চলের আর্ত কান্না আজও মিশে আছে। কুবের, নীলকণ্ঠ, সুবল, হরমু জানি, শম্ভু মহাকুদ, হারাধন ভোই, আশু কাঁসার, কর্ণ কুমার, পার্বতী এদের কখনো পরস্পরের সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু মহানদীর সূত্রে জীবন যাপনের বৃত্তান্তে তারা বাধা পড়ে যাবে।

তথ্যসূত্র:

১. অগ্নিহোত্রী, অনিতা। মহানদী। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা– ৭৩, প্রথম প্রকাশ: ২০১৫, পৃ. ৪২।
২. তদেব, পৃ. ৪৮।
৩. তদেব, পৃ. ৫১।
৪. তদেব, পৃ. ৫১।
৫. তদেব, পৃ. ৮৪।
৬. তদেব, পৃ. ৭৮।
৭. তদেব, পৃ. ৯৩।
৮. তদেব, পৃ. ১০৪।
৯. তদেব, পৃ. ১৪৯।
১০. তদেব, পৃ. ১৬৯।
১১. তদেব, পৃ. ২৬৮।
১২. তদেব, পৃ. ২৯০।

সহায়ক প্রবন্ধ:

১. ভট্টাচার্য, শম্পা। মহানদী। চলমান জীবনের আখ্যান।
২. মুখোপাধ্যায়, অমর্ত্য। অনিতা অগ্নিহোত্রীর মহানদী। একটি বিমোহিত, অসংলগ্ন প্রতিক্রিয়া।